Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি এবং কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোবাশ্শেরা খাতুন

রোলঃ 23090121654

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি এবং কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোবাশেশরা খাতুন

রোলঃ 23090121654

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম কি এব কেন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোবাশেরা খাতুন, আইডিঃ 23090121654 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম কি এব কেন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মোবাশ্শেরা খাতুন

আইডিঃ 23090121654

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয়.....5

ইসলাম কী.....6

ইসলামের পরিচয়.....6

ইসলামকে জানার উপায়.....7

কোরআনুল কারীম এবং হাদীসের আলোকে ইসলাম.....7

কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিনগন জাহান্নামে চিরস্থায়ী নন.....20

আত্মসমর্পণ:.....27

ইসলাম কেন?.....32

সামাজিক জীবনের ইসলাম:.....35

রোগীর সেবা করা ও দেখতে যাওয়া :.....41

শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান :.....46

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা:.....50

ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার স্বরূপ.....59

আলোচ্য বিষয়

মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই সকল সফলতার ভিত্তি | বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি । সঠিক বিশ্বাস মানুষকে সফলতার শিখরে তুলে দেয় এবং তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ।

আমরা জানি , বিশ্বাস এবং কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমানই ইসলামের মুল ভিত্তি । এখানে আমি এই লেখনীতে প্রথমত চেষ্টা করব ইসলাম কি? এরপর ইসলাম কেন? তা লেখার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

ইসলাম কী

- ভূমিকা: ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একমাত্র মুক্তির পথ ও নির্দেশিকা। যুগে যুগে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে তথা ইসলামের দাওয়াত দিতে। সর্বশেষ এই দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা.। তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলামের পূর্ণতা পায় এবং আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দেন।

ইসলামের পরিচয়

'ইসলাম' আরবী শব্দ। 'اَلْإِسْلَامُ' ক্রিয়ামূল থেকে এর অর্থ, 'নতি স্বীকার করা', 'আত্মসমর্পণ করা', `Submission [to Allah]'। পরিভাষায় 'ইসলাম' দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বোঝানো হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে 'মুসলিম' বলে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত ও খেয়াল খুশিমত না চলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে এবং নিজেকে তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পণ করে দেয় তাকেই 'মুসলিম' বলে।

দ্বীন শব্দের বেশকিছু অর্থ রয়েছে। মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন হলো, ما دينك؟ 'তোমার দ্বীন কী'? এখানে দ্বীন বলতে, জীবন ব্যবস্থা বা ধর্ম। আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে যে পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবো বা যার উপর ভিত্তি করে আমাদের পথচলা সেটিই আমাদের দ্বীন। পৃথিবীর সকল ধর্ম একেকটি ভিন্ন ভিন্ন দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা।

ইসলামকে জানার উপায়

ইসলাম কী? এ প্রশ্নের উত্তর কোন ব্যক্তিগত মতামত উপর নির্ভর করে না। অবশ্যই তা আমাদেরকে কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানতে হবে। এর বাহিরে সমস্ত বিশ্বাস, মতবাদ,চিন্তা বাতিল।

কোরআনুল কারীম এবং হাদীসের আলোকে ইসলাম

কোরআনের আলোকে ইসলাম হলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর ইচ্ছানুসারে পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও রাসুল (সা.)-এর দেখানো পথে জীবনযাপন করা। এটি শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের আল্লাহ তা'য়ালা মানব কল্যাণে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান 'ইসলাম'কে নির্বাচন করেছেন। পৃথিবীর সকলধর্মের উপরে একমাত্র নিখুঁত, সংশয়মুক্ত ও শাশ্বত ঐশী জীবন বিধান হলো 'ইসলাম'। ফলে ইসলামের কাছে পৃথিবীর সকল মানবসৃষ্ট ধর্ম পরাজিত। পৃথিবীতে বিদ্যমান কোনো ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে, কোনো ধর্ম নিছক মানুষের তৈরি, কোনো ধর্ম সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও অযৌক্তিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ইসলামের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সবকিছুকে হার মানিয়েছে। মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। আছে জীবন ঘনিষ্ঠ ও অতুলনীয় বিধান। ইসলাম সকল প্রকার সমস্যা ও জটিলতামুক্ত এবং সহজতর একটি দ্বীন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ব্যাপারে সহজতা চান, জটিল ও কঠিনতা চান না।' (বাক্বারা: ১৮৫)

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূল সা. এর প্রতি সবিশেষ ওহী ছিল দ্বীন হিসেবে ইসলামের পরিপূর্ণতা নিয়ে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করলাম।' (মায়িদা: ৩)

এই ইসলাম নবী সা. এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এটি অটল, অবিকৃত ও অবিচল থাকবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা মুমীনদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে নির্বাচন করে দিয়েছেন। তাই ইসলামের মধ্যে নতুন করে কোনো কিছু তৈরি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের

সুযোগ নেই। আর ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত একটি সার্বজনীন, জীবন ঘনিষ্ঠ ও শাশ্বত দ্বীন হিসেবে বিবেচিত হবে।

হাদীসে ইসলামের পরিচয়

হাদীসের আলোকে ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তৈরি। হাদীসের মূল বিষয়গুলো হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (শাহাদা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ), যা একজন মুসলমানের মৌলিক দায়িত্ব, এবং যা একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে।
ইসলামের মূল ভিত্তি (হাদীসের আলোকে)

- আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য প্রদান: আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন।
- সালাত (নামাজ): দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।
- যাকাত: সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করা।
- সাওম (রোজা): রমজান মাসে রোজা রাখা।
- হজ: সামর্থ্য থাকলে জীবনে একবার হজ করা।

ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক

- শান্তি ও আত্মসমর্পণ: 'ইসলাম' শব্দের মূল ধাতু থেকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ধারণা এসেছে, যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- নৈতিকতা ও জীবনযাপন: ইসলাম নৈতিক জীবনযাপন, ন্যায়পরায়ণতা, এবং সুষম জীবনযাপনের উপর জোর দেয়, যা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিধান: ইসলামে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন - বিবাহ, বিচার, অর্থনীতি, ও সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।
- জ্ঞানার্জন: ইসলাম জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কুরআন ও হাদীস যেমন জ্ঞানের উৎস, তেমনি মুসলিমদের জন্য জ্ঞানার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।
- অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ: ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য এসেছে এবং অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতে নির্দেশ দেয়।

হাদীসে জিবরীল খ্যাত ঐতিহাসিক একটি হাদীসে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। একবার নবী সা. সবার সামনে উপবিষ্ঠ ছিলেন। তখন মানুষের ছদ্মবেশে জিবরীল আ. এসে নবী সা. কে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে একটি হলো, ‘ইসলাম’ কী? উত্তরে নবী সা. বলেন-

قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ "

‘ইসলাম হলো, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরজকৃত বিধান যাকাত প্রদান করবে আর রমাদানের সিয়াম পালন করবে।’ (বুখারী: ৫০) এখানে ইসলামের পরিচয়ে পাঁচটি মূল ভিত্তির কথা বলা হয়েছে।

কোরআন ও হাদীসে ইসলামের মুল বিষয়: একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদানুসারে আমল করাই হচ্ছে ইসলামের মুল বিষয়। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি,

তাওহীদ: আল্লাহ এক, এবং তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। এই বিশ্বাসই ইসলামের ভিত্তি।

তওহীদ অর্থ হলো একত্ববাদ, যা ইসলামের একটি মৌলিক ধারণা, যেখানে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি এমন একটি বিশ্বাস যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা উচিত। এটি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) এই শাহাদাতের (ঈমানের সাক্ষ্য) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

তাওহীদ এর অর্থ: তওহীদ একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো একত্ববাদ বা এক ঈশ্বরবাদ। ইসলামিক ধারণা: এটি ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা তাওহীদকে ঈমানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

মৌলিক ধারণা: এর মূল কথা হলো আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

শাহাদা: এটি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই" এই শাহাদাত বা ঈমানের সাক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

আল আকীদা আত-তাহাবিয়া বা আল আক্বীদাহ আত-তহাউইয়া (আরবি: العقيدة الطحاوية) হল দশম শতাব্দীর মিশরীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ও হানাফী আলেম আবু জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল তহাবী লিখিত সুন্নিদের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বেশকয়েকজন মুসলিম ব্যাখ্যাকারক এই বইটির ব্যাখ্যা লিখেছেন।

এই বইটিতে একজন মুসলিমের যে যে বিশ্বাস থাকা জরুরী তা নিম্নে তুলে ধরছি :

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনা :

1: মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে তার তাওহীদ সম্পর্কে আমরা বলছি যে, নিশ্যয়ই আল্লাহ এক, যার কোনো শরীক নেই।

2: তার সদৃশ কোন কিছুই নেই।

৩। কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না।

৪। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই ।

৫। তিনি কাদীম (অনাদি, অবিনশ্বর, প্রাক্তন), যার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত-চিরন্তন, যার কোনো অন্ত নেই |)

৬। তার ধ্বংস নেই, তিনি ক্ষয়প্রাপ্তও হবেন না।

৭। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া অন্য কিছু হয় না।
৮। কল্পনা ও ধারণাসমূহ তার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারে না। জ্ঞান-বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে পারে না।

৯। সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।

১০। তিনি চিরন্জীব, কখনো মারা যাবেন না। চির জাগ্রত, কখনো নিদ্রা যান না।

১১। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির প্রতি তার কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই তিনি রিযিকদাতা ।

১২। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ হরণকারী , তিনি বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী।

১৩। সৃষ্টির বহু পূর্বে থেকেই তিনি তার অনাদি গুনাবলীসহ শাশ্বত সত্তা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছেন। আর সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কারণে তার এমন কোনো নতুন গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি চিরন্তন ও চিরন্জীব থাকবেন ।

১৪। সৃষ্টি করার পর তার গুণবাচক নাম খালেক (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। আর সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কারণে তার গুণবাচক নাম বারী (উদ্ভাবক) হয়নি।

১৫। আল্লাহ তা'আলা প্রতিপালন করার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণে বিশেষিত, কিন্তু তিনি কারো দ্বারা প্রতিপালিত নন। তিনি সৃষ্টি করার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণে বিশেষিত, কিন্তু তিনি কারো দ্বারা সৃষ্ট নন। আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন খালেক বা সৃষ্টিকর্তা ।

১৬ । মৃতদেরকে জীবন দান করার পর যেমন তিনি জীবনদানকারী নাম ও বিশেষণে বিশেষিত ঠিক তেমনি তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এই নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপ তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই আটা নাম ও গুণের অধিকারী ছিলেন।

১৭। এটা এ জন্য যে, তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান । প্রত্যেক সৃষ্টিই তার মুখাপেক্ষী এবং সব কিছুই তার জন্য সহজ তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। তার মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৮। তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন

১৯। তিনি তাদের জন্য তাকদীর (সব কিছুরই পরিমাণ) নির্ধারণ করেছেন।

২০। তিনি তাদের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

২১। সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তার কাছে গোপন ছিল না। এমনিভাবে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।

২২। তিনি তাদেরকে তার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩। সবকিছু তার নির্ধারণ এবং ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়। তার ইচ্ছাই কার্যকর হয়, তার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

২৪। আল্লাহ অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা, তাকে হেদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।

২৫। আর সকলেই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং সবাই তারই অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

২৬ । তিনি কারও প্রতিদ্বন্দী এবং সমকক্ষ হওয়ার বহু উর্ধ্বে ।

২৭। তার ফয়সালার কোনো প্রতিহতকারী নেই। তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তার নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

২৮। উপরে উল্লিখিত সব কিছুর উপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আগত।

নাবী মুহাম্মদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা

২৯। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নাবী এবং পছন্দনীয় রসূল ।

৩০। তিনি নাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নাবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রসুলগণের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব-বন্ধু।

৩১। তার পরে যেসব লোক নবুওয়াতের দাবি করবে, তাদের প্রত্যেকের দাবিই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৩২। তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতি সহকারে সকল জিন ও সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত।

কুরআনুল কারীমের প্রতি ঈমান আনা

৩৩। নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম। যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। এ কালামকে তিনি তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী হিসাবে নাযিল করেছেন। আর ঈমানদারগণ তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কালাম । কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টি নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআন শুনে তাকে মানুষের কালাম বলে ধারণা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তার নিন্দা

করেছেন, তাকে দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের এ ভীতি তা তাকে প্রদর্শন করিয়েছেন যে বলে,

"এটাতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়" (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:২৫)।

অতএব, আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম । আর তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

আল্লাহ তাঁআলাকে মানবীয় গুণে বিশেষিত করা

৩৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা"আলাকে মানবীয় কোনো গুণে বিশেষিত করবে, সে কাফির হবে । অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরের চোখ দিয়ে এতে গভীর দৃষ্টি প্রদান করবে সে সঠিক শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর কাফিরদের মত কুরআনকে মানুষের কথা বলা হতে বিরত থাকবে । আর সে জানতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার গুণাবলিতে মানুষের মত নন।

(জান্নাতীদের জন্য) আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য

৩৫ । আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য । তবে সেই দেখা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়, তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা । যেমনটি আমাদের রব কুরআন ঘোষণা করেছে, " সেদিন অনেক মুখমনডল আনন্দোজজল হবে , সেগুলো তার রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" (সুরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩)। এ দেখার ব্যাখ্যা হলো, একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সেভাবেই এটি অর্জিত হবে। আর এ সম্পর্কে যা কিছু সহীহ হাদীছে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তা যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবেই গৃহীত হবে । তিনি যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটিই ধর্তব্য হবে। এতে আমরা আমাদের নিজস্ব মতের উপর নির্ভর করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাড়িত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না। কারণ কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দীনকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে, যখন সে মহান আল্লাহ এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে । আর সংশয়ের ব্যাপারসমূহকে আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিবে

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা

৩৬। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত কারও পা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের

নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার সেই ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফত ও বিশুদ্ধ ঈমান হতে বঞ্চিত রাখবে । ফলে সে কুফরী ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যায়ন, স্বীকৃতি প্রদান ও অস্বীকৃতি, সন্দেহ-পেরেশান এবং দ্বিধা-দ্বন্দের অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে । সে না সত্যবাদী মুমিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে ।

৩৭। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দিদার-সাক্ষাৎ লাভের উপর এ ব্যক্তির ঈমান আনয়ন বিশুদ্ধ হবে না, যে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে, অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সেই দিদারের তাবীল করবে বা ভুল ব্যাখ্যা দিবে । কারণ আল্লাহকে দেখার বিষয়টি এবং রবের অন্যান্য গুণাবলির বিষয়ের ব্যাপারে প্রকৃত কথা হচ্ছে এগুলোর কোনোরূপ তাবীল করার অপচেষ্টা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবেই অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা । এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন। যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যসত গুণাবলিকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলির সাথে তার বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্থলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে । আমাদের মহান রব একক ও নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণে ভূষিত নয়।

মুশাব্বিহাহ-সাদৃশ্যবাদীদের খণ্ডন করা

৩৮। আর আল্লাহ তাআলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সরজ্জাম, উপাদান-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়ার অনেক উর্ধে । সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে , দিকসমুহ তাকে সেভাবে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ইসরা ও মিরাজ এর প্রতি বিশ্বাস রাখা

৩৯ । আর মিরাজ সত্য, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা আকসায় ভ্রমণ করানো হয়েছিল । অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো উর্ধ্বে নেয়া হয়েছিল । সেখানে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন। তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি । সুতরাং আল্লাহ তার উপর আখেরাতে এবং দুনিয়ার জগতে দরুদ ও সালাম পেশ করুন।

হাউয, শাফা“আত ও অঙ্গীকার (মী-ছাক) এর প্রতি ঈমান আনা

৪০। আর হাউয যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য।

৪১। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত সত্য । যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন । যেমনটি বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

৪২। আল্লাহ তাআলা আদম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যেই অঙ্গীকার (মী-ছাক) গ্রহণ করেছেন তা সত্য ।

আল্লাহ তা'আলার "ইলমের প্রতি ঈমান আনা

৪৩ । মহান আল্লাহ আদি থেকেই জানেন, সর্বমোট কত সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে আর কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে যাবে । এ সংখ্যায় কোনো কমবেশী হবে না। অর্থাৎ এ সংখ্যা কমবেও না, বাড়বেও না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত।

বান্দার কমসমৃর্থ

৪৪ । যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষ কর্মই ধর্তব্য

শেষ কর্ম দ্বারা মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে এবং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়ছালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়ছালায় হতভাগা বলে নির্ধারিত হয়েছে।

ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা

৪৫। তাকদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নাবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের ধাপ। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকদীর সম্পর্কিত জ্ঞান তার সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন

এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন । যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (সুরা আল আমবিয়া ২১:২৩)। অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল । আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হল।

৪৬। তাকৃদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনয়ন করা প্রয়োজন উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর ওলীদের মধ্যে যার অন্তর জ্যোতিদীপ্ত তার জন্য এতটুকু জানাই প্রয়োজন । আর এটিই হচ্ছে জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞাবানদের স্তর। ইলম দুই প্রকার। (১) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান। (২) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান নয়। বিদ্যমান ইলমকে অস্বীকার করা যেমন কুফরী, অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবী করাও তেমনি কুফরী । বিদ্যমান ইলম কবুল করা, আর অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষণ করা হতে বিরত থাকা ব্যতীত কারো ঈমান সুদৃঢ় বিশুদ্ধ হবে না।

লাওহে মাহফুষ ও কলমের উপর ঈমান রাখা

৪৭। আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের উপর । আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার সবকিছুতে । যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত হবার কথা তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্টিজীব একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। যা বান্দার নসীবে লিখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না আর যা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না।

৪৮। বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত । অতএব, তিনি সেটাকে অকাট্য ও অবিচল তাকৃদীর হিসাবে নির্ধারিত করেছেন । আসমান ও যমীনের কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না, একে সংকোচন কিংবা পরিবর্ধনও করতে পারবে না। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফাতের মূলবস্তু এবং আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান। করেছেন এবং তাকে যথাযথ অনুপাত অনুসারে পরিমিতি প্রদান করেছেন (সূরা আল ফুরকান ২৫:৩)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন: আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত (সুরা আল আহযাব ৩৩:৩৮)। অতএব, ঐঁ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে ব্যক্তি তাকৃদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্তব্য

করেছে এবং রোগক্রান্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়েছে।

আরশ ও কুরসীর উপর ঈমান আনা

৪৯। আর আরশ এবং কুরসী সত্য ।

৫০। আর আল্লাহ তা'আলা আরশ এবং অন্যান্য বস্ত থেকে অমুখাপেক্ষী ।

৫১। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাকে পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

আল্লাহ তা'আলার কথা বলাকে সাব্যস্ত করা

৫২। আমরা আরও বলি যে, আল্লাহ রব্দুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মুসা আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন, এর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে।

মালাঈকা, নাবী ও আসমানী গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান আনা ।

৫৩ | আর আমরা মালাঈকা বা ফেরেশতা ও নাবীগণের উপর বিশ্বাস করি এবং রসুলগণের উপর নাধিলকৃত কিতাবসমূহের উপরও বিশ্বাস করি । আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তারা সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৫৪ । আমাদের কিবলার যে সমস্ত লোক নাবী সন্দাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই দীন নিয়ে এসেছেন তার স্বীকৃতি দেয় এবং তার সকল কথা ও খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মুমিন মনে করি ।

আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে মগ্ন হওয়া এবং আল্লাহর দীন ও কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা হারাম ।

৫৫ | আমরা আল্লাহর ব্যাপারে অযথা তর্ক করি না এবং আল্লাহর দীন নিয়ে ঝগড়া করি না।

৫৬ | আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করি না। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, কুরআন আল্লাহর কালাম । জিবরীল আমীন তা নিয়ে অবতরণ করেছেন এবং সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম । মাখলুকের কোন কালাম এর সমান হতে পারে না। আমরা বলি না যে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। আর আমরা মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করি না।

গুনাহের কারণে আহলে কিবলার কাউকে কাফির না বলা

৫৭। আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফির বলি না। যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সে গুনাহয় লিপ্ত হয়।

মুরজিয়াদের খণ্ডন করা

৫৮। আর এ কথাও বলি না যে, ঈমান আনয়নের পর কেউ গুনাহ করলে তাতে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না।

৫৯। মুমিনদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করি এবং তার রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আশা করি। তবে তাদেরকে সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত মনে করি না এবং তাদের জন্য নিশ্চিতরূপে জান্নাতের সাক্ষ্যও প্রদান করি না। আর মুমিনদের মধ্যে যারা গুনাহগার, তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাদের উপর আযাবের আশঙ্কা করি। তবে তাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করি না।

আললাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

৬০ । আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। মুসলিমদের জন্য উভয়ের মাঝখানে অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার রহমতের আশা করার মধ্যেই সঠিক পথ ।

৬১। বান্দাকে যে বিষয় ঈমানে দাখিল করেছে, তা অস্বীকার ব্যতীত সে ঈমান থেকে খারিজ-বের হবে না।

ঈমানের পরিচয়

৬২। জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান |

৬৩ । শরী'আতের যত বিষয় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দ্বহীহবিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার সবই সত্য ।

৬৪। ঈমান মাত্র একটি জিনিসের (অন্তরের বিশ্বাসের) নাম। সকল ইমানদার
মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সমান । আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তি দমন এবং উত্তম আমলের মাধ্যমে মুমিনদের মর্যাদার পার্থক্য হয়।

৬৫। সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী (বন্ধু)। মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে এ মুমিন, যে সর্বাধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসরণে সর্বাধিক অগ্রগামী ।

ঈমানের রুকনসমূহ

৬৬ | ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান,তার রসুলগণের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ও মিষ্টতা-তিক্ততার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ।

৬৭। আমরা ঈমানের সকল বিষয়ের প্রতিই বিশ্বাস করি । রসুলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করি না। তারা যা নিয়ে এসেছেন, তাতে তাদের সকলকেই বিশ্বাস করি।

কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিনগন জাহান্নামে চিরস্থায়ী নন

৬৮ । উম্মতে মুহাম্মদের মধ্য গুনাহ্য় লিপ্ত হবে, তারা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও তারা তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে। বিশেষ করে যখন তারা আল্লাহর মারেফাতসহ তার সাথে সাক্ষাত করবে (মৃত্যু বরণ করবে) । তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের আওতায় । তিনি ইচ্ছা করলে তাদের গুনাহসমূহ ঢেকে রাখবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন: এ ছাড়া অন্যান্য যত গুনাহ হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন (সুরা আন নিসা ৪:৪৮)। আর তিনি যদি চান, স্বীয় ইনসাফে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে তাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমতে এবং তার অনুগত বান্দাদের শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন । অতঃপর জান্নাতে পাঠাবেন । এটি এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার মারেফতের অধিকারীদের অভিভাবক হয়েছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে এ সব লোকের মত করেননি, যারা তাকে চিনতে (তার মারেফত হাসিল করতে) না পেরে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর বেলায়াত অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো ।

ইমাম ও শাসকদের আনুগত্য ওয়াজিব

৬৯ । আমরা আহলে কিবলার প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পিছনে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয মনে করি এবং তাদের মৃতদের উপর জানাযা সলাত পড়া ও তাদের জন্য দোয়া করাকে বৈধ জানি।

৭০। আমরা কোন মানুষের জন্য অকাট্যভাবে জান্নাতের কিংবা জাহান্নামের ফয়সালা প্রদান করি না । আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিম থেকে কুফরী, শির্ক কিংবা নিফাকী প্রকাশিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিক বলি না। আর মুসলিমদের অন্তরের গোপন বিষয়কে আল্লাহ তাআলার কাছেই সোপর্দ করি।

৭১। যার উপর অস্ত্র ধরা আবশ্যক হয়েছে, সে ব্যতীত উম্মতে মৃহাম্মাদীর অন্য কোন লোকের উপর আমরা অস্ত্র ধরা বৈধ মনে করি না।

৭২। আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করা ও অস্ত্র ধারণ করা বৈধ মনে করি না, যদিও তারা যুলুম করে । তাদের উপর বদদু'আও করি না। তাদের থেকে আমরা

আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেই না। তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ও ফরয মনে করি। যতক্ষণ না তারা পাপ কাজের আদেশ করে । আমরা তাদের সংশোধন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি।

আহস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ করা

৭৩। আমরা সুন্নাহ ও জামা'আতের অনুসরণ করি । জামা'আত থেকে বিচ্ছিন হওয়া, দলাদলি করা ও ফির্কাবন্দী হওয়া থেকে দূরে থাকি।

৭৪। আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী ও আমানতদারগণকে ভালোবাসি এবং যালেম ও খেয়ানতকারীদেরকে ঘৃণা করি।

৭৫। যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট, সে বিষয়ে আমরা বলি: আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত ।

৭৬। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা সফরে বা গৃহে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ মনে করি।

কিয়ামতপর্যন্ত হজ্জ ও জিহাদ ওয়াজিব

৭৭। ভালো-মন্দ সকল মুসলিম শাসকের অধীনে হজ্জ করা ও জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । কোন কিছুই এ দু'টি কাজকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না।

মালাঈকা ও বারযাখের প্রতি ঈমান

৭৮। আমরা কিরামুন-কাতিবীন (সম্মানতি লেখকবৃন্দ) ফেরেশতাদেয়ের উপর ঈমান রাখি। আল্লাহ তাআলা তাদরেকে আমাদরে উপর পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন ।

৭৯। আমরা সৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত মালাকুল মাউত এর উপরও ঈমান রাখি ।

৮০। আমরা কবরের আযাবের প্রতিও ঈমান রাখি । আরো বিশ্বাস করি যারা এই আযাবের যোগ্য কেবল তাদেরকেই এই শাস্তি দেয়া হবে । নাকীর-মুনকার ফেরেশতাদ্বয় কবরে যে প্রশ্ন

করবেন, তার প্রতিও আমরা ঈমান রাখি । তারা প্রশ্ন করবেন বান্দার রব সম্পর্কে, দীন সম্পর্কে এবং তার নাবী সম্পর্কে । এ বিষয়গুলো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কেরাম হতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আমরা ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করি।

৮১। কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের অন্যতম একটি বাগিচা অথবা তা জাহান্নামের গর্তসমূহের অন্যতম একটি গর্ত।

কিয়ামত দিবস ও তাতে যা ঘটবে তার প্রতি ঈমান আনা

৮২। আমরা পুনরুত্থান, কিযয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, আল্লাহর সমীপে বান্দার আমলনামা পেশ করা, হিসাব নিকাশ, আমলনামা পাঠ করা, বান্দার আমলের ছাওয়াব ও শাস্তি, পুলছিরাত এবং মীযান- এ সবের উপর ঈমান রাখি।

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা

আমরা আরো ঈমান রাখি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্বেই সৃষ্ট করা হয়েছে। এ দু'টি কোনো দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয়প্রাপ্তও হবে না। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য বস্ত সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন । তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা তার পক্ষ হতে

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন । প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে। বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি যা বান্দা অর্জন করে |

৮৪। ভালো ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮৫ । যেই শক্তি দ্বারা বান্দা কর্ম সম্পাদন করে এবং যেটি আল্লাহর তাওফীকের অন্তর্ভূক্ত, তা কোন বান্দার গুণ হতে পারে না। সেটি কর্ম বাস্তবায়িত করার সময় বিদ্যমান থাকে । এ প্রকার শক্তি (তাওফীক) কেবল আল্লাহরই গুণ (এটি আল্লাহ তার আনুগত্যশীল বান্দাকেই দিয়ে থাকেন)। আর যে প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য বলতে বান্দার সুস্থতা, কাজ করার শক্তি, কর্ম শুরু করার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা জরুরী । এটা বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই বান্দাকে তাকলীফ করা হয় অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তার উপর প্রযোজ্য হয়, নতুবা নয়। যেমন আল্লাহ

তা'আলা বলেন: “তিনি কারো উপর তার সামধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না” (সূরা আল বাকারা ২:২৮৬)।

৮৬। আল্লাহর বান্দারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, সেগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ । বান্দা শুধু তা অর্জন করে।

সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ

৮৭। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাদের সামর্থের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি । আর আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম । আর এটিই হচ্ছে لا حول ولاقوة الابالله এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কোনো অন্যায় কর্ম করা হতে বিরত থাকতে পারে না এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ সৎ কাজ করারও ক্ষমতা রাখে না। তাই আমরা বলি যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্য এবং কোন ক্রিয়া ফলপ্রসু হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করার এবং তার উপর দৃঢ় থাকার কারো কোন সাধ্য নেই।

৮৮। সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তার জ্ঞান, তার ফায়ছালা এবং তার তাকৃদীর অনুসারেই সংঘটিত হয় । তার ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপর জয়লাভ করে এবং তার অভিপ্রায় সমস্ত অভিপ্রায়ের উপর জয়যুক্ত হয়। তার ফয়সালা সৃষ্টির সকল কলা-কৌশলকে পরাভূত করে। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি কখনো কারো উপর অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষতা ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে, বান্দাদের সকলেই তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (সুরা আল আমবিয়া ২১:২৩)।

৮৯। জীবিত ব্যক্তিদের দু'আ এবং দান খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়।

৯০। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের দু'আ কবুল করেন এবং তাদের প্রয়োজন পুরণ করেন।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আর আমরা তার প্রতি মুখাপেক্ষী

৯১। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুরই মালিক এবং তার মালিক কেউ নয় । মুহূর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয় । যে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী মনে করবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

৯২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘‘আলা রাগান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন, তবে তার রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়া কোনো মাখলুকের রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়ার মত নয়।

রসূলুল্লাহ স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে

৯৩। আর আমরা রসুলুল্লাহ ইল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে ভালোবাসি । আমরা তাদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের সমালোচনা করে আমরাও তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাদের ভালো কর্মগুলো বর্ণনা করি। ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা হচ্ছে দীন, ঈমান ও ইহসান এবং তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরী, মুনাফিকী এবং যুলুম ও সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত।

৯৪। আমরা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতি দেই, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি এবং তাকে উম্মতের সমস্ত মুসলিমের উপর প্রাধান্য দেই। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খেলাফত সাব্যস্ত করি । অতঃপর উছমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খেলাফত সাব্যস্ত করি। অতঃপর আলী বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খেলাফত সাব্যস্ত করি। তারাই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সুপথগামী খলীফা এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম।

৯৫। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশ জন ছাহাবীর নাম উল্লেখ তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ তার কথা সত্য ও সঠিক। তারা হলেন: আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, জুবাইর, সাদ,সাঈদ, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ এবং এ উম্মতের আমানতদার আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম ।

৯৬। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবী, কলঙ্ক হতে পূতপবিত্র তার স্ত্রীগণ, প্রত্যেক কদর্যতা হতে পবিত্র তার সন্তান সন্ততিগণ সর্ম্পকে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম কথা বলবে, সেই কেবল মুনাফিকী হতে নিষ্কৃতি পাবে।

৯৭। পূর্বে গত হওয়া পূর্বসুরী সালাফদের মধ্যকার আলেম, তাদের পথ অনুসরণকারী সৎকর্মশীল মুহাদ্দিছ এবং জ্ঞানী, গবেষক ফকীহদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি । যারা অসম্মানের সাথে তাদেরকে স্মরণ করে, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী ।

নাবীগণ আউলিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ

৯৮। আমরা কোনো ওলীকে কোন নাবী আলাইহিমুস সালাম এর উপর প্রাধান্য দেই না; আমরা বলি: মাত্র একজন নাবী সমস্ত ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ।

৯৯। ওলীদের কারামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের কারামত সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোকদের থেকে সহীহ সুত্রে বর্ণিত বিষয়ের উপরও আমরা ঈমান রাখি ।

কিয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান আনা

১০০। আমরা কিয়ামতের আলামতসমূহ: যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান হতে ঈসা (আঃ) এর অবতরণ, পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে বের হওয়া ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখি ।

১০১। আমরা কোনো গণক ও জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না এবং ঐ ব্যক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কিছু দাবী করে।

১০২।আমরা মুসলিমদের জামা'আতবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করি এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গোমরাহী ও আযাবের কারণ মনে করি।

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম

১০৩ । নভোমনডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন । তা হলো ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম (সুরা আলে-ইমরান ৩:১৯)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম (সুরা আল মায়িদা ৫:৩)।

দীন হচ্ছে মধ্যপন্থী

১০৪। ইসলামের অবস্থান হলো বাড়াবাড়ি ও বিয়োজনের মাঝখানে, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে) তাশবীহ তথা সাদৃশ্য স্থাপন ও তা'তীল তথা অর্থহীন করার মাঝে তার অবস্থান।

(তাকৃদীর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে) জাবর তথা ক্ষমতাহীন বাধ্য কিংবা কাদর তথা তা অস্বীকার করার মাঝে তার অবস্থান । অনুরূপ আল্লাহর রহমতের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা কিংবা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম পন্থার নীতি অবলম্বন করেছে।

আমাদের দীন

১০৫। এগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দীন-জীবন ব্যবস্থা ও আকীদাহ বা বিশ্বাস। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে (অন্তরে) আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোকেই দীন হিসাবে গ্রহণ করি । উপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম এবংবর্ণনা করলাম, যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

প্রত্যাখ্যাত মাযহাবসমূহ

আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর দিকেই ফিরে যাই। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যুদান করেন।

আমরা আরো প্রার্থনা করি , তিন যেন আমাদরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত, প্রবৃত্তির অনুসরণ, নানা রকম মতবাদ এবং এ সব মুশাব্বিহা, মুতাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদারিয়া এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বাতিল মতবাদসমূহ থেকে, যারা সুন্নাত ও জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং বিভ্রান্তদের পক্ষ নিয়েছে। আমরা তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট। আল্লাহর নিকটেই যাবতীয় বিভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক কামনা করছি।

আত্মসমর্পণ:

ইসলাম' আরবি শব্দ। 'আল ইসলাম' ক্রিয়ামূল থেকে এর অর্থ, 'নতি স্বীকার করা', 'আত্মসমর্পণ করা'; পরিভাষায় 'ইসলাম' দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বোঝানো হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাকে 'মুসলিম' বলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো ও খেয়াল-খুশিমতো না চলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে এবং নিজেকে তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পণ করে দেয় তাকেই 'মুসলিম' বলে। আর দ্বীন শব্দেরও বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন হলো, 'তোমার দ্বীন কী'? এখানে দ্বীন বলতে, জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম। আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে যে পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলি বা যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের পথচলা সেটিই আমাদের দ্বীন। পৃথিবীর সব ধর্ম একেকটি ভিন্ন ভিন্ন দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা।

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার জন্য মূলমন্ত্র হিসেবে দিয়েছেন ইসলাম। মানবসভ্যতার সূচনা থেকেই যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে এবং ইহকালীন যাপিত জীবনের নির্দেশনা শিক্ষা দিতে। মানবজাতির জন্য সবশেষ এই পয়গাম নিয়ে আগমন করেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে স্বীকৃত দান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দেন। হিজরতের দশম বছর ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (সা.)-এর প্রতি সবিশেষ ওহি ছিল ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করলাম' (সুরা মায়িদা : ৩)।

মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম নবী (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এটি অটল, অবিকৃত ও অবিচল থাকবে। আর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে নির্বাচন করে দিয়েছেন। তাই ইসলামের মধ্যে নতুন করে কোনো কিছু তৈরি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুযোগ নেই। আর ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত একটি সার্বজনীন, জীবন ঘনিষ্ঠ ও শাশ্বত দ্বীন হিসেবে বিবেচিত থাকবে।

ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে হাদিসে জিবরিল খ্যাত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আমরা এক দিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বসে ছিলাম।

হঠাৎ একজন আগন্তুক আমাদের কাছে এলো। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কালো ছিল। বাহ্যত সফরের কোনো চিহ্ন তার ওপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবীজি (সা.)-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু নবীজির হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর ওপরে রেখে বলল- হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানে রোজা রাখবে এবং কাবা ঘরের হজ করবে; যদি সেখানে যাওয়ার সংগতি রাখো। সে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা তাঁর কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে!' (বুখারি : ৫০)। এখানে ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে পাঁচটি মূল ভিত্তির কথা বলা হয়েছে যেগুলো ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত।

ইসলাম উদার ও মানবিকতাসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কোনোরূপ সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ির জায়গা ইসলামে নেই। মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্তে ইসলামের আগমন। অন্ধকার ও জাহালত থেকে মুক্ত করে মানবজাতিকে সত্যের দিশা দিতে মহামহিম আল্লাহ ইসলামকে নির্বাচন করেছেন। তিনি বলেন, 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কঠোরতা চাপিয়ে দিননি' (সুরা হজ : ৭৮)। মূলত সব ধরনের প্রান্তিকতামুক্ত উদার ও মধ্যমপন্থাই হলো শ্রেষ্ঠতম পথ। আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে একটি মধ্যমপন্থি দ্বীন বানিয়েছেন।

আর ইসলামের অনুসারীগণ হলো মানবকুলের মধ্যে একমাত্র মধ্যমপন্থি ও সাক্ষ্যদানকারী জাতি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আর এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন।' (সুরা বাকারা : ১৪৩)

আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বজাহানকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতে। প্রকৃতিকে তিনি নিজের মতো সাজিয়েছেন আর ছেড়ে দিয়েছেন আপন অবস্থায়। প্রকৃতির দিন-রাত্রি, আকাশ-বাতাস, পৃথিবীর বুকে হাজারো সৃষ্টিকুল সবকিছু আপন গতিতে চলমান। এই প্রকৃতির নির্ধারিত ধর্ম রয়েছে।

আর সেটি হলো 'ইসলাম'। পৃথিবীর সব জড়বস্তু ও জীববস্তু আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে বা ইসলামের ওপর রয়েছে। এরপরও যারা অবিশ্বাস করে ও ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য পথ তালাশ করে তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়

হোক, তাঁরই অনুগত এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে’ (সুরা আলে ইমরান : ৮৩)। পার্থিব জীবনে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও প্রভুর নির্দেশিত জীবনবিধান অনুসরণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের তওফিক দান করুন। (সংকলন : গুগল, মওলানা আব্দুর রহমান)

রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ: ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখানো পথ এবং তাঁর শিক্ষা ও জীবনাচার (সুন্নাহ) অনুসরণ করা।

ইসলামে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করা আল্লাহর আনুগত্যের সমতুল্য এবং এটি ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ (রাসূলের জীবনাচার) অনুযায়ী জীবনযাপন করা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হেদায়েত লাভের পথ। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়, যা মুমিনদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম।

রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ কেন জরুরি

আল্লাহর নির্দেশ: কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর" (সূরা নিসা: ৫৯)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূলের আনুগত্য করা আল্লাহরই আনুগত্য।

পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ: রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ এবং জীবনাচার হলো ইসলামের মডেল, যা অনুসরণ করে একজন মুসলিম পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে।

জান্নাত লাভের মাধ্যম: রাসূল (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি ছাড়া"। যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

কীভাবে রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করা যায়

কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ: রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করার অর্থ হলো তাঁর দেখানো পথ, অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করা।

আদেশ ও নিষেধ পালন: রাসূল (সা.)-এর আদেশগুলো পালন করা এবং নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরি।

জীবনাচরণের প্রতিচ্ছবি: কোরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে হলে রাসূল (সা.)-এর জীবনাচারকে অনুসরণ করতে হবে।

উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ: আল্লাহ কোরআনে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আল-আহযাব: ২১)।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান: ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয় কারণ এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সকল বিষয়সহ মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এটি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ সমাধান ও দিকনির্দেশনা দেয়।
কেন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়?

সকল সমস্যার সমাধান: মানবজীবনের সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান ও দিকনির্দেশনা ইসলামে রয়েছে।

সর্বজনীনতা: এটি শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।
জীবনের সকল ক্ষেত্রে নির্দেশনা: ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো পরিচালনা করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে।
পরকালের জীবন: ইসলামে শুধু দুনিয়ার জীবন নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের বিষয়েও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা রয়েছে।

সম্পূর্ণতা: নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জীবন বিধানকে বিশ্ববাসীর জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।
মুক্তির পথ: কোরআনের মতে, ইসলামই একমাত্র পথ যা ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি দিতে পারে (সূরা আলে ইমরান: ১৯)।

ইসলামকে মুক্তির পথ হিসেবে দেখা হয় কারণ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নির্দেশনা দেয়। এর মধ্যে তাওহীদ (এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস), ইবাদত এবং সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করা।
ইসলামকে মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করার কারণ
পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে, যেমন - ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ।
শান্তি ও নিরাপত্তা: এর লক্ষ্য হলো মানব সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

এক আল্লাহর ইবাদত: ইসলামে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং তাঁরই ইবাদতের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা মানুষকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।
সৎকর্মের গুরুত্ব: মুক্তির জন্য শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বরং আন্তরিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম করাও অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে পাপ থেকে অনুতাপ, প্রার্থনা, যাকাত, ও দান-সদকার মতো কাজগুলো।
কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ: ইসলামে, মুক্তির জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দেখানো পথ অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবিদের দেখানো পথ ও মতকে অনুসরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।
সরল ও সহজ পথ: ইসলামকে একটি সহজ ও সরল পথ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

পরিষেশে, ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামই একমাত্র পথ। এই পথে চলার জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ইসলাম কেন?

ভূমিকা : ইসলাম হলো আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, যেখানে ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দেখানো পথে জীবন যাপন করে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায় এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেয়। ইসলামের মূল ভিত্তি হলো এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর রাসূল হিসেবে স্বীকার করা, যা 'শাহাদা' বা সাক্ষ্য প্রদান নামে পরিচিত।

কেন ইসলাম?

ইসলাম একটি জীবন বিধান, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে, তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে এবং নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম পথে জীবনযাপন করতে শেখায়। ইসলামকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো, এটি শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে এবং পরকালীন মুক্তির উপায় সমূহ শিক্ষা দেয়।

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের শান্তি নিশ্চিত করতে চায় এবং অশান্তি সৃষ্টি করে এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি জীবনের সকল দিক যেমন - ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলাম কেন গুরুত্বপূর্ণ: ইসলাম কেন বা এর গুরুত্ব কি তা ইহকালীন এবং পরকালীন এর আলোকে নিম্নে তুলে ধরছি ।

ব্যক্তি জীবনে ইসলাম:

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা আধ্যাত্মিকতা এবং দৈনন্দিন আচরণের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, সততা, বিশ্বস্ততা, এবং নৈতিক আচরণের মতো বিষয়গুলো, যা ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে এবং আদর্শ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনকে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার সাথে

পরিচালনা করার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং একে একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জীবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব :

বিদায় হজের ভাষণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।' এ-কথার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দিলেন, যা হলো ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে আদর্শবান ব্যক্তিত্বে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এটি মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি।

কোরআন ও হাদিসে ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক জায়গায় আলোকপাত করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ-বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাকওয়া। তাকওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলা। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০২)
মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে বলার নির্দেশ দেয়ার কারণই হলো ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। যার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো তাকওয়া। তাকওয়া ব্যক্তিজীবনে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সাফল্যের চাবিকাঠি। এটি মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

যেমন হাদিস শরীফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
"তোমরা সততা অবলম্বন করো, কারণ সততা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০৯৪)

এছাড়া ব্যক্তিজীবনে ন্যায়পরায়ণতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)

ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তিজীবনে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। ন্যায়পরায়ণতার পাশাপাশি প্রয়োজন ধৈর্য ও সহনশীলতারও। জীবনের ভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩)
ধৈর্য ব্যক্তিজীবনে মানসিক শক্তি ও স্থিরতা প্রদান করে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

এছাড়াও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অন্যের উপকার কিংবা মানুষের সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পরোপকার ও দানশীলতাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, যারা মানুষের উপকার করে।" (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩৩৪)
পরোপকারী ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এছাড়াও দানশীলতা, উদারতা ও মহত্ব তাদেরকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করে।

এছাড়াও একজন ব্যক্তি তার জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও সদাচরণ ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা অনেকেই ব্যক্তিজীবনে পরিবারের সদস্যদের সাথে সদাচরণ করি না। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের প্রতি সদাচরণের উত্তম দৃষ্টান্ত নিজেই স্থাপন করে গিয়েছেন। এটা সুন্নাহও।
ইসলামেও পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও সদাচরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)

পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা ব্যক্তিজীবনে শান্তি ও সুখ বয়ে আনে এবং সমাজে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলে। পারিবারিক কলহ পরিবারের শিশুদের জীবনকে দুর্বিষহ করে ও সমাজে সবার কাছে নিন্দনীয় পরিবার হিসেবে পরিচিতি পায়। পরিবারের প্রতি সদাচরণের জন্য একজন ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ হৃদয় ও বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।
এ-ব্যাপারে পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "যে ব্যক্তি তার আত্মাকে শুদ্ধ করল, সে সফলকাম হলো। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করল, সে ব্যর্থ হলো।" (সূরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০)
বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হলেই ব্যক্তিজীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কারণ এটি মানুষকে আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ

সুগম করে। কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত এসব মূল্যবোধ অনুসরণ করে আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সামাজিক জীবনের ইসলাম:

সামাজিক জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, কারণ এটি সামাজিক সম্প্রীতি, পারস্পরিক সাহায্য, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। ইসলাম সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা, অন্যের কল্যাণে সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সততা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে তুলে ধরছি,

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা: ইসলাম মানুষকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে এবং একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে। এটি শুধু মানুষের প্রতিই নয়, এমনকি পশুপাখির প্রতিও দায়িত্বশীল হতে শেখায়।
সামাজিক ন্যায়বিচার: ইসলাম সকল প্রকার শোষণ, অবিচার এবং বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটি সমাজের দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি বিশেষ নজর দিতে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়।

নীতিকতা ও সততা: ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সততা, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এটি মিথ্যা, প্রতারণা, এবং অন্যায় থেকে মানুষকে দূরে থাকতে শেখায়।

শান্তি ও সম্প্রীতি: ইসলাম সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উপর জোর দেয়। এটি শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব: ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়। এটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে উন্নতি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

সামাজিক নিরাপত্তা: ইসলাম একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা থাকে।

সামগ্রিকভাবে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনব্যবস্থা প্রদান করে, যা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রয়োজনই পূরণ করে।

ইসলামে সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব

ইসলামে সামাজিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক বন্ধন সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'মাসিক আত তাহরিক' পত্রিকায় সামাজিক জীবন ইসলামের কতটা প্রয়োজন তা তুলে ধরেছে,

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। তাই সামাজিক জীবনে পরস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সমাজকল্যাণমূলক ধর্ম। মানব কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজকল্যাণ বলতে মানুষের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বুঝায়। আর ইসলাম মানুষকে অন্যের কল্যাণে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (মায়েদাহ ৫/২)।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، '(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন'।[1]
অন্য বর্ণনায় এসেছে, জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، 'আমি এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেছি যে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করব'।[2]
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ، 'আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে'।[3] এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইসলামে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইয়াতীম প্রতিপালন :

সমাজের সবচেয়ে অসহায় অবহেলিত, নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিরাপত্তাহীনভাবে দীনাতিপাত করে একজন ইয়াতীম শিশু। তাই সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বরে রয়েছে ইয়াতীম শিশু। মহান রাববুল আলামীন কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে ইয়াতীম শিশু প্রতিপালন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, নিরাপত্তা দান, তাদের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা ও সদাচরণের বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করে এটিকে অত্যন্ত নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ، '(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামন্ডলী, আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ، 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি অংশ ইয়াতীমদের জন্য নির্ধারিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، 'আর তোমরা জেনে নাও যে, যুদ্ধে তোমরা যে সকল বস্তু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তার এক পঞ্চমাংশ হ'ল আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য' *(আনফাল ৮/৪১)*।

ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا، 'ইয়াতীমদেরকে তাদের মালামাল বুঝিয়ে দাও এবং মন্দকে ভালো দ্বারা বদল করো না। আর তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর পাপ' *(নিসা ৪/২)*। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আরো কঠোর হুঁশিয়ার করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 'যারা

অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

জান্নাতী লোকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، 'তারা আল্লাহর মহববতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

ইয়াতীম প্রতিপালনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁকা করলেন'।[4] প্রায় অনুরূপ হাদীছ এসেছে ছহীহ মুসলিম[5] ও সুনানে আবূদাঊদে।[6]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ، 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[7]

বিধবাকে সহায়তা দান :

সমাজের আরেক অসহায় শ্রেণীর নাম হচ্ছে বিধবা। বিশেষ করে দরিদ্র, নিঃস্ব, অবহেলিত বিধবা নারী। এমন বিধবাকে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদত তুল্য নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، يَشُكُّ الْقَعْنَبِىُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ، 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা বছরই ছিয়াম পালন করে'।[8]

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান :

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করার জন্য মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকীদ দিয়েছেন। জান্নাতের প্রবেশের ঘাঁটির সন্ধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ، 'অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা, ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে' *(বালাদ ১৪-১৬)*।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিঃস্ব-দরিদ্র, ইয়াতীম ও কারাবন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، 'তারা আল্লাহর মহববতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হ'ল- অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ، فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়, এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মাঊন ১০৭/১-৩)*।

অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যও বটে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، 'কোন বস্তু তোমাদেরকে 'সাকারে' প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪২-৪৪)*।

যারা অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে না হাশরের দিনে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিবেন তাদের গলায় রশি লাগিয়ে টেনে হিছড়ে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে। আল্লাহ বলেন,خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، '(তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ) গলায় বেড়ীবদ্ধ করো ওকে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে। অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩০-৩৪)*।

অভাবগ্রস্ত, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান না করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই শাস্তি স্বরূপ তাদের সম্পদ কমিয়ে দেন অথবা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ، وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ، أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّوْنَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُوْنَ، قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ-

'আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে। কিন্তু তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ'ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল। ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায়

হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যুষে উঠে পরস্পরকে ডেকে বলল, যদি তোমরা ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল। অতঃপর তারা চলল চুপিসারে কথা বলতে বলতে, যেন আজ বাগিচায় তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত প্রবেশ না করে। অতঃপর তারা দ্রুতপায়ে খুব ভোরে যাত্রা করল। কিন্তু যখন তারা বাগানের চেহারা দেখল, তখন বলল আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, যদি না তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলতে)! তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা অবাধ্য ছিলাম' *(ক্বালাম ৬৮/১৭-৩১)*।

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো ইসলামের উত্তম আমল। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ،

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, 'তুমি (অভাবীকে) খাদ্য খাওয়াবে'।[9]

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খাওয়া কোন মুমিনের কাজ নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، 'সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[10]

উল্লিখিত আয়াত সমূহ ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ইসলামের অন্যতম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগীর সেবা করা ও দেখতে যাওয়া :

রোগীর সেবা করা বা রোগীকে দেখতে যাওয়া ইসলামের অন্যতম সমাজকল্যাণমূলক ও পুণ্যময় কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে এক মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের হক্ক বা অধিকার বলে অভিহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. 'একজন মুমিনের ওপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- ১. যখন কোন মুমিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করা ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযাহ ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া ৩. কেউ দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেয়া ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা ৫. হাঁচি দিলে জবাব দেয়া এবং ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুমিনের কল্যাণ কামনা করা'।[11]

রোগীকে দেখতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ 'ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[12] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ 'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, জানাযায় অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[13]

অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা না করলে বা দেখতে না গেলে এর জন্য হাশরের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ، 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কি করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে'।[14]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বৈধ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন,مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ، 'তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'।[15]

যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে বা দেখতে যায় তার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا- 'কোন ব্যক্তি যখন রোগীকে সেবা করে বা দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের উদ্যানে

ফল আহরণ করতে থাকে। বলা হ’ল, হে রাসূল (ছাঃ)! ‘খুরফা’ কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল’।[16]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا ‘যে ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে’।[17]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ، ‘এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, অথচ তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো‘আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো‘আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়’।[18]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِى الْجَنَّةِ مَنْزِلاً ‘যখন কোন মুসলিম তার কোন ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হ’ল, তোমার চলন উত্তম হ’ল এবং তুমি জান্নাতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে’।[19]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা :

প্রতিবেশী হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে নিকটজন, যিনি তার খবরা-খবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশী জানেন। সুখ-দুঃখ, বিপদাপদে প্রতিবেশীই সবার আগে এগিয়ে আসে। তাই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, তাদের বিপদাপদে এগিয়ে যাওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা সুখী-সমৃদ্ধশালী, সুশৃংখল, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের বিকল্প নেই। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، ‘জিবরীল (আঃ) সদা-সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন’।[20] প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করলে সে কখনো পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,وَاللهِ

.لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ .قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
‘আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’।[21]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’।[22] অন্য বর্ণনায় এসেছে,مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’।[23]

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে খাদ্য না দিয়ে যে ব্যক্তি পেটপুরে খায় সেও প্রকৃত মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، ‘ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে’।[24]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ، ‘তোমরা যখন তরকারী রান্না করবে, তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে।[25]

কর্যে হাসানাহ :

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্যে হাসানাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। চির অভিশপ্ত সূদী কারবারকে প্রতিহত করতে হ’লে কর্যে হাসানার বিকল্প নেই। সামাজিক দৈন্য, পারিবারিক কলহ সহ নানা অসংগতি দূরীকরণে কর্যে হাসানাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়করণ, দারিদ্রবিমোচন, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ সহজেই দূর করা সম্ভব।

কর্যে হাসানাহ প্রদান সাধারণ দান-ছাদাক্বার ন্যায় নেকআমল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً، ‘যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু’বার ঋণ দান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ন্যায় হবে’।[26] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِى مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ‘নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ দান ছাদাক্বার অর্ধেক’।[27] তিনি আরো বলেন, كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ ‘প্রত্যেক কর্যে ছাদাক্বার ছাওয়াব রয়েছে’।[28]

ক্ষেত্র বিশেষে দান-ছাদাক্বার চেয়েও কর্যে হাসানার ছওয়াব বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ‘জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় লিখিত দেখতে পেল যে, ছাদাক্বায় দশগুণ (ছওয়াব) এবং ঋণদানে আঠারগুণ (ছওয়াব রয়েছে)’।[29]

অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে সহজ ব্যবস্থা করে দিলে বা ক্ষমা করে দিলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، 'যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক সে যেন ঋণগ্রস্ত অক্ষম লোককে সহজ ব্যবস্থা করে দেয় কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়'।[30] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা (সম্পূর্ণ বা কিছুটা ঋণ) মওকূফ করে দিবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না'।[31] তিনি আরো বলেন,مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন'।[32]

ঋণগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য সময় দিলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছওয়াব পাওয়া যায়। বুরায়দা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ .قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ .قُلْتُ سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ .ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ .قَالَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. 'যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিমিয়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর তাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিমিয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। আমি বললাম, আপনাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিমিয়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিমিয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। তখন তিনি বললেন, কেউ যদি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু সময় দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাবে যতক্ষণ না ঋণ আদায়ের সে নির্ধারিত দিন এসে যায়। উক্ত নির্ধারিত দিন এসে যাওয়ার পর যদি সে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ দু'বার ছাদাক্বা করার ছাওয়াব পাবে'।[33]

ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِىَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، 'পূর্ব যুগের জনৈক লোক মানুষকে ঋণ দান করত।

আর সে তার চাকরকে (কর্মচারীকে) বলত, অভাবী ঋণগ্রস্ত কোন লোকের কাছে (ঋণের অর্থ আদায় করতে) গেলে তাকে ক্ষমা করে দিও। আশা করা যায় আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর মৃত্যুবরণ করে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করল। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।[34]

ত্রাণ বিতরণ :

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষ দুর্যোগে নিপতিত হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নিঃস্ব হ'তে পারে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, নদী ভাঙ্গাসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যেকোন সংকটময় অবস্থায় অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ,،

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদ সমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ'তে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন।[35] অন্য বর্ণনায় এসেছে,وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন'।[36] পৃথিবীর অধিবাসীদের বিপদাপদে, সংকটময় মুহূর্তে সাহায্যে এগিয়ে আসলে আসমানের অধিবাসী আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ، 'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহ'লে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[37]

শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান :

শরণার্থীর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Refugee তথা উদ্বাস্তু। Convention related to the status of Refugee এর অনুচ্ছেদ-১ এ বলা হয়েছে: 'শরণার্থী হ'ল এমন ব্যক্তি যারা ধর্ম, বর্ণ ভাষা, গোষ্ঠী বা জাতীয়তা বা সমাজের কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে,অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার সুনিশ্চিত ভয় থেকে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য দেশত্যাগ করে বা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তি যে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেটা তার সাধারণ বাসস্থান যেটা সাধারণ অবস্থার পরিপন্থী'।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শরণার্থীর বিষয়টি নতুন কোন বিষয় নয়। অতীতকাল থেকেই মানুষ নিজ জন্মভূমিতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্বাস্ত হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ মক্কার কাফির-মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়ে প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ মদীনায় হিজরত করেন।

আল্লাহপাক ঈমানের বরকতে আনছাগণের মধ্যে এমন মহববত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে উদ্গ্রীব ছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তারা ছিলেন ঈমানী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সবাই মুহাজিরগণকে স্ব স্ব পরিবারে পেতে চান। ফলে মুহাজিরগণকে আনছারদের সাথে ভাই ভাই হিসাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের জমি, ব্যবসা ও বাড়ীতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করে নেন। এমনকি যাদের দু'জন স্ত্রী ছিল, তারা একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুহাজিরগণের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁরা ইতিহাসে 'আনছার' নামে অভিহিত হয়েছেন।[38]

মুহাজিরদের আশ্রয়দানকারী আনছারদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন,وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

কোন মানুষ নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিলে তাদেরকে কিভাবে আশ্রয় দিতে হয়, সাহায্য করতে হয় এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়

তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মদীনার আনছারগণ। এমন বদান্যতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশ তথা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, বসনিয়া, আফগানিস্তান এবং সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের শরণার্থী সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই এ সকল শরণার্থীদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে’।[39] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তা‘আলাও তার প্রতি দয়া করেন না’।[40]

রক্তদান :

রক্তদান হ’ল কোন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৬০) সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেয়ার প্রক্রিয়া। এই দান করা রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অথবা অংশীকরণের মাধ্যমে ঔষধে পরিণত করা হয়। রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে অবস্থিত অস্থিমজ্জা (Bon Marrow) নতুন রক্ত কণিকা তৈরীর জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং রক্তদান করার দুই/তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকার জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ করে। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই রক্তদানকে ক্ষতিকর মনে করে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। বছরে ৩ বার রক্তদান করলে শরীরে লোহিত কণিকাগুলো প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে তোলার সাথে সাথে নতুন রক্তকণিকা তৈরীর হার বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, রক্তদান করার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বছরে দুইবার রক্ত দেয়। অন্যদের তুলনায় তাদের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বিশেষ করে ফুসফুস, লিবার, কোলন, পাকস্থলী ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে অনেক কম পরিলক্ষিত হয়। নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মাধ্যমে নিজের শরীরে বড় কোন রোগ আছে কিনা তা বিনা খরচেই জানা যায়। যেমন- হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইচআইভি ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিয়মিত রক্তদান করে রক্ত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলা উচিত। জনৈক কবি বলেছেন,

‘সময় তুমি হার মেনেছ রক্তদানের কাছে
দশটি মিনিট করলে খরচ একটি জীবন বাঁচে’।

উল্লিখিত পঙক্তি দু’টিতে কবি যথার্থ কথাই বলেছেন। রক্ত দান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতির ক্লু সৃষ্টি হয় মাত্র ১/২ ব্যাগ রক্ত হ’লেই আল্লাহর রহমতে রোগী বেঁচে যেতে পারে। কেননা রক্তের বিকল্প আজও কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি।

থ্যালাসেমিয়া রোগী, অপারেশনের রোগী, এ্যাক্সিডেন্টে রক্ত শূন্য হয়ে মৃত্যু পথযাত্রীসহ এমন সংকটময় মুহূর্তে মাত্র এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বাঁচতে পারে একটি প্রাণ। আর এ প্রাণ বাঁচানো এমনই পুণ্যময় কাজ যে, মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন একজন লোককে বাঁচানোকে সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচানোর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا 'আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ، 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে'।[41]

সাংগঠনিকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা :

সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলো এককভাবে ও সাংগঠনিকভাবে এ দু'প্রক্রিয়ায় করা যায়। তবে এককভাবে এগুলো করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর সহজতা, উপকারিতা ও ফলাফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'রক্তদান' কর্মসূচী। কোন সাংগঠনিক প্রচার-প্রচারণা, কার্যক্রম না থাকলে অনেকেই রক্ত দানের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে পারে না বিধায় রক্তদানে উৎসাহী হয় না; এমনকি নিজের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কেও অনেকেই জানে না এবং রক্ত গ্রহীতাগণও সংকটময় মুহূর্তে জানতে পারে না কোথায় যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যাবে। আবার এমন কিছু দুর্লভ গ্রুপের রক্ত রয়েছে যা সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই তারা বাধ্য হয় 'ব্লাড ব্যাংক' থেকে উচ্চমূল্যে বাসী ও মাদকাসক্তদের রক্ত সংগ্রহ করতে। ব্লাড ব্যাংকে যারা রক্ত বিক্রি করে তাদের ৯০% মাদকাসক্ত। কারণ মাদকাসক্তরা মাদক কেনার মত টাকা-পয়সা না থাকলে রক্ত বিক্রি করে হ'লেও তারা মাদক ক্রয় করে। আর একজন মাদকাসক্তের রক্ত মানেই বিভিন্ন রোগ জীবানুতে ভরপুর। এ ধরনের রক্ত শরীরে গ্রহণ করা মানেই রোগকে আমন্ত্রণ জানানো। পক্ষান্তরে সাংগঠনিকভাবে 'রক্তদান' মানেই সহজলভ্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও তাজা রক্ত। উদাহরণ স্বরূপ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে পরিচালিত 'আল-আওন' নিরাপদ রক্তদান কর্মসূচী। এটি এমন একটি 'রক্তদান' কার্যক্রম দেশের প্রায় প্রতিটি যেলা-উপযেলায় এর সদস্য রয়েছে।

এর প্রতিটি সদস্য দ্বীনদার, পরহেযগার বিধায় এদের রক্ত সম্পূর্ণই মাদকমুক্ত ও নিরাপদ। দেশব্যাপী রয়েছে এদের সদস্যের নেটওয়াক। দেশের যেকোন প্রান্তেরই সংকটময় মুহূর্তে উক্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্বশীল বা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যায়। রক্তদাতা স্রেফ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রক্তদান করে থাকেন। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে রক্তদানের গুরুত্ব, তাৎপর্য, উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে জনসচেনতা সৃষ্টি করা হয়।

অনুরূপভাবে ইয়াতীম প্রতিপালন, বিধবাকে সহায়তা দান, নিঃস্ব, দরিদ্রকে খাদ্য-অর্থদান, কর্যে হাসানাহ, ত্রাণ বিতরণ, শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্য করা ইত্যাদি ব্যক্তিগতভাবে করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর উপকারিতা ও ফলাফল সুদূর প্রসারী।

উপসংহার :

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানব কল্যাণকামী ধর্ম। তাই ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোকে ইবাদততুল্য কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এতে রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি। তাই প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিত এ সকল সমাজকল্যাণ মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত লাভের পথকে সুগম করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ মহান কাজে ব্রতী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

রেফা : মাসিক তাহরিক পত্রিকা

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা:

ইসলামে আত্মশুদ্ধি একটি মৌলিক ও অপরিহার্য শিক্ষা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করে এবং ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে সফল হয়। এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম পথ এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি সংযত মনোভাব ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করে। আত্মশুদ্ধির জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই, যেমন - গীবত, চোগলখুরি, মিথ্যাচার, রাগ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا-)الشمس 9-10(

‘সফল হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে’। ‘এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে’ (শাম্স ৯১/৯-১০)।

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূর্য, চন্দ্র, দিবস, রাত্রি, আকাশ, পৃথিবী ও মানুষসহ আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করার পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার লোকেরাই পৃথিবীতে সফলকাম এবং কলুষিত আত্মার লোকেরা সর্বদা ব্যর্থকাম। তাদের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ যতই পবিত্র হৌক এবং সামাজিক মর্যাদা যতই উন্নত হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে’।[1]

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘তাযকিয়া’ (التزكية) অর্থ التزكية من الشرك وشوائب المعاصي ‘শিরক ও পাপের কালিমাসমূহ হ’তে পবিত্র হওয়া’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ‘সফলকাম হ’ল সেই ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল’ (আ‘লা ৮৭/১৪)। মূলতঃ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হ’তে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আর তিনি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল’। ‘এবং এটা তাদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ (জুম‘আহ ৬২/২-৩)।

অত্র আয়াতদ্বয়ে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদম সন্তানের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর সেই আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আর তার ভিত্তিতে যথার্থ ইলম ও আমলের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুদ্ধিতা অর্জন করা।

দ্বিতীয় আয়াতে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে যে, ব্যর্থকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে'। অর্থাৎ যারা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে গিয়ে সাফল্য তালাশ করে, তারা শয়তানের খপপরে পড়ে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, خاب من دس نفسه في المعاصي 'ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, যার আত্মা পাপে ডুবে গেছে' (কুরতুবী)। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ও সে পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' (বাক্বারাহ ২/৮১)।

আত্মশুদ্ধির উপায় সমূহ :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ মানুষের ও বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনিই আমাদের রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। তিনি যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এ আকাংখা ও ভয় সর্বদা লালন করা। সাথে সাথে প্রতিটি কর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, সর্বদা এ দায়িত্বানুভূতি জাগরুক থাকা। আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' (রহমান ৫৫/৪৬)। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল' (নাহল ১৬/১২৮)। অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

(২) সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলা : আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো' (হাশর ৫৯/৭)। আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর 'অহি' ব্যতীত (নাজম ৫৩/৩-৪)। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল' (নিসা ৪/৮০)। তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। বস্তুতঃ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلا بِطَاعَتِهِ 'হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি 'অহি' করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহর নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না'।[2]

অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ছালাত-ছিয়াম-হজ্জের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন, যাকাত আদায় ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে মালশুদ্ধি অর্জন ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের মনগড়া ছয় লতীফার যিকর বা ক্বলব ছাফ করার নামে নানাবিধ মা'রেফতী কলা-কৌশলের মাধ্যমে নয়। এগুলি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের করে শয়তানের আনুগত্যে বন্দী করে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত ঐসব বন্দীশালা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!

যদি মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় না করে, তাহ'লে তার কাছে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ থাকে না। সে হয় স্রেফ প্রবৃত্তিপূজারী একটি বস্তুবাদী জীব মাত্র। আল্লাহ বলেন, فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় হঠকারী এবং তারা হয় গর্বোদ্ধত' (নাহল ১৬/২২)। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে' 'এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়' 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রাখে' 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' (নাযে'আত ৭৯/৩৭-৪১)।

(৩) মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা : আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং

তোমাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (আন'আম ৬/১৬৫)।

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। সবল শ্রেণী পাপ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে তারা আরও পাপে উৎসাহিত হয়। দুর্বল শ্রেণী লঘু পাপে গুরুদন্ড পায়। আবার অনেক সময় বিনা পাপে দন্ড ভোগ করে। ফলে মন্দ কাজের শাস্তি না পেয়ে সবল শ্রেণী যেমন উদ্ধত হয়। তেমনি বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে দুর্বল শ্রেণী হতাশ হয় এবং প্রায়ই তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে। তাই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেখানে যালেম তার যথাযথ শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে।

কিয়ামতের দিন মন্দ কাজের শাস্তি কিরূপ হবে, সে বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝে দেয়া হবে'।[3]

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[4]

২. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উপরে (মি‘রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনু আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম। সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল’।[5] ইনি হলেন বনু খুযা‘আর নেতা আমর বিন লুহাই বিন আমের, যিনি প্রথম শাম (সিরিয়া) থেকে ‘হোবল’ মূর্তি কিনে এনে কা‘বা গৃহে স্থাপন করেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদী দ্বীনের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরকের প্রবর্তন করেন।

৩. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে আগুনে পুড়ে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং গাধা যেমন গম পেষার সময় ঘানির চারপাশে ঘুরতে থাকে, অনুরূপভাবে সেও তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় জাহান্নামবাসীরা সেখানে জমা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে? জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম’[6]

৪. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ ‘যে আলেম মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেয় এবং নিজে সেটা ভুলে যায়, তার তুলনা ঐ প্রদীপের মত যা মানুষকে আলো দেয়, অথচ নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়’।[7] অর্থাৎ আমলহীন আলেম জাহান্নামী হবে।

৫. হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু’জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম (১) একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে

দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই-ই করে (এই ভাবে একবার এগাল একবার ওগাল চিরতে থাকে)। আমি বললাম এটা কি? তারা দু'জন বলল, সামনে চল। (২) অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি একটা ভারি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথর ছুঁড়ে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর পাথরটি দূরে গড়িয়ে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়। ইতিমধ্যে তার মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায়। তখন পুনরায় সে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৩) আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে একটা গর্তের নিকটে এলাম। যা ছিল বড় একটা চুলার মত। যার উপরাংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। যার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা আছে, তারাও উপরের দিকে উঠে আসত এবং তারা গর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার উপক্রম হ'ত। আবার যখন আগুন নীচে নামত, তখন তারাও নীচে নেমে যেত। এর মধ্যে ছিল একদল উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৪) অতঃপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটা রক্তের নদীর কিনারে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ও নদীর কিনারে একজন দাঁড়িয়ে। যার সামনে রয়েছে একটি পাথরের খন্ড। অতঃপর নদীর মধ্যের লোকটি যখনই তীরে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখনই তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার চেহারা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে লোকটি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে সে পূর্বে ছিল। এভাবে যখনই লোকটি তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই কিনারে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি বললাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

... অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা দিল যে, (১) প্রথম ব্যক্তি যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল, ওটা হ'ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হ'ত। এমনকি তা সর্বত্র পৌঁছে যেত। ফলে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (২) যে ব্যক্তির মাথা পাথর ছুঁড়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ'ল সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও সে অনুযায়ী আমল করত না। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (৩) আগুনের চুলার গর্তে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল যেনাকার।

আর (৪) রক্তের নদীর মধ্যে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল সূদখোর'। ... আর আমি হ'লাম জিবরীল এবং ইনি হ'লেন মীকাঈল'।[8]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার অবাধ্য (অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী) সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও নিয়মিত মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[9] 'তাদেরকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করানো হবে'।[10]

৩. ছগীরা গোনাহ সমূহ পরিত্যাগ করা :

ছগীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটা করলে তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কেননা ছগীরা গোনাহ মানুষকে কবীরা গোনাহের দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে, নেশাকর বস্তু বিষয়ে এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিষয়ে এক পা বাড়ালেই তা চুম্বকের মত মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসবের সামান্যতম সুড়সুড়ি পেলেই ওটাকে শয়তানী ধোঁকা মনে করে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম বলে ছুটে পালাতে হবে। যুক্তি-তর্কের কবলে পড়লেই শয়তানের ফাঁদে আটকে যেতে হবে। অতএব খালেছ তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ও সকল ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দার কোন অমঙ্গল করেন না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন' (তালাক ৬৫/৩)।

মনে রাখতে হবে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। বলা হয়ে থাকে, لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار 'ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা ছগীরা থাকে না এবং তওবা করলে আর কবীরা থাকে না'। কবি ইবনুল মু'তায বলেন, لاَ تُحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً +إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى 'ছোট গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। নিশ্চয়ই পাহাড় গড়ে কংকর দ্বারা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হ'তে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছে'[11] হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِىَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ '(হে লোকসকল!) তোমরা এমনামন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম'।[12]

৪. সর্বদা কবর ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করা :

(ক) হযরত ওছমান গণী (রাঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে আপনি কাঁদেন না। অথচ এ থেকে কাঁদেন। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ- قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صـ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ 'নিশ্চয়ই কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তীগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে এর পরেরগুলি অধিকতর কঠিন হবে'। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখিনি'।[13]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো'।[14]

(গ) আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا- ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ওটা (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে না। আর এটি তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত'। 'অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের সেখান থেকে উদ্ধার করব এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে রেখে দেব' (মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জাহান্নামের উপর পুলছিলাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমিই রাসূলগণের মধ্যে প্রথম যিনি তার উম্মতকে নিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করবেন। আর সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কথা বলবেন না। তারা কেবল বলবেন, হে আল্লাহ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সা'দান কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের আংটাসমূহ থাকবে। সেগুলি যে কত বড় বড় তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। ঐ আংটাগুলি মানুষকে ধরে নিবে তাদের আমল অনুযায়ী। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে, কেউ শাস্তিতে পিষ্ট হবে। অতঃপর মুক্তি পাবে'।[15] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ জাহান্নামের কিনারায় আসবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। কেউ চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের গতিতে বেরিয়ে যাবে। কেউ ঘোড়দৌড়ের গতিতে, কেউ সাধারণ আরোহীর গতিতে। কেউ পায়ে চলার গতিতে অতিক্রম করবে'।[16]

ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা খারেজী নেতা নাফে' বিন আযরাক্বকে বলেন, আমি ও তুমি অবশ্যই পুলছিরাতে হাযির হব। অতঃপর আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে নাজাত দিবেন। কিন্তু তুমি! আমি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিবেন। কেননা তুমি এটা মিথ্যা মনে করে থাক (কুরতুবী)। মু'তা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন

রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার আগে কাঁদতে কাঁদতে অত্র আয়াতটি পাঠ করে বলেন, لا أدري أنجو منها أم لا؟ 'আমি জানি না পুলছিরাত থেকে আমি মুক্তি পাব কি-না' (ইবনু কাছীর)। অতএব হে মানুষ! মৃত্যু ও জাহান্নামকে ভয় করো।

৫. সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে'। 'সেই মহা দিবসে'? 'যেদিন সকল মানুষ জগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে'? (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)। এই আয়াত পর্যন্ত এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি ক্রন্দন করতেন। অতঃপর কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্বলিত হাদীছ শুনাতেন। তাছাড়া তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাবধান করতেন (কুরতুবী)। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বস্ততঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক'। 'অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' (আ'লা ৮৭/১৬-১৭)। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনই অংশ থাকবে না' (শূরা ৪২/২০)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় আনছারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তি। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন,أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হ'ল বিচক্ষণ ব্যক্তি'।[17] এরপরেও সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা তাঁর রহমত ভিন্ন নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না।

উপরোক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করলে মুমিনগণ তাদের অন্তরজগতকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

_____________প্রফেসর ড.

ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার স্বরূপ

সফলতা মানব জীবনে উত্তরণের একটি অন্যতম হাতিয়ার। ইহলৌকিক জীবনের নানা স্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার জন্য আমরা অবিরত সংগ্রাম করি। সংগ্রামী চেতনা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অতুলনীয় সাহায্য করে। দীর্ঘ অধ্যবসায় বা নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সফলতা লাভ করা যায় তার একটা সুমিষ্ট স্বাদ আমরা আস্বাদন করি। সফলকাম কৃতি ব্যক্তির প্রতি সামাজিক যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে বিফল ব্যক্তির আসমান যমীন তফাৎ। সফল ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। অপরদিকে ব্যর্থ ব্যক্তি সর্বত্র অবহেলা ও তুচছ-তাচিছল্যের বস্তু। আমরা সাধারণত পার্থিব জগতের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিরিখে একজনের সফলতা বিচার করি। অর্থ, জশ, বিত্ত, বৈভব-শৌর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতির মাপকাঠিতেই সফলতা যাচাই করি।

উন্নত চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাদের সফলতার গন্ডির বাইরে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে যতটা অর্থ, খ্যাতি ও প্রভাবের অধিকারী সে ততই সফল। কেউ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে আমরা তাকে সফল ব্যবসায়ী বলি। অভিনয় জগতে যিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি সফল অভিনেতা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যার যত বেশী রোগী তিনি তত বেশী সফল চিকিৎসক। অতি সম্প্রতি যে বক্তার যত বেশী দাবী কিংবা যার ফেসবুক লাইকারের সংখ্যা সর্বাধিক এবং ইউটিউব এ ফলোয়ার ও সাবস্ক্রাইবার-এর সংখ্যা অধিক তিনি ততই সফল ব্যক্তিত্ব। এসবই প্রধানত আমাদের চোখে সফলতার নির্ণায়ক, যদিও শরী'আত বলে অন্য কথা।

ইসলামের দৃষ্টিতে পার্থিব জগতের সফলতা চূড়ান্ত সফলতা নয়, বরং পারলৌকিক জীবনের সার্থকতাই সর্বাপেক্ষা মহা সফলতা। দীর্ঘ পড়াশুনা ও বিরাট গবেষণার পর একজন ছাত্র জীবনে প্রতিষ্ঠা না পেলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। নিজের নৈরাশ্যকে আপন করে পরিবার ও সমাজ থেকে আলাদা করে নেয়। তার বন্ধু-বান্ধবরা সরকারী চাকুরী পেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সফল হয়েছে, অথচ চাকুরী না পেলেও আত্মসম্মানের সাথে জীবন-যাপন করতে কোন অসুবিধা নেই। দুর্নীতির যাঁতাকলে অনেক মেধাবী ছাত্রের জীবন পিষ্ট। জালিয়াতির করাল গ্রাসে অনেক প্রতিভাবান জীবন নির্মম পরিহাসের শিকার। তেজদীপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মুখে হাসি ফোঁটানোর তীব্র ইচছা দিন দিন নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। এমন ব্যর্থতার গ্লানি আমাদের জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয়। সদা মনে রাখা উচিত চরম ব্যর্থতা অপেক্ষা করছে পরলোকে। এ জীবনের ব্যর্থতা ক্ষণিকের মাত্র। তথাপি প্রতিভার সাথে অর্থ-সম্পদের বোঝার দায়িত্ব আরও অনেক বেশী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ-

‘নিশ্চয়ই দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য। ১ম শ্রেণীর ব্যক্তি হ’লেন তিনি, আল্লাহ যাকে অর্থ ও জ্ঞান উভয়ই দান করেছেন। সে বিষয়ে তিনি তার রবকে ভয় করেন, তার সম্পদ তিনি তার আত্মীয়-পরিজনদের কাছে পৌঁছে দেন। আর সে ব্যাপারে তিনি আল্লাহর হক সম্পর্কে অবগত। তিনি সর্বোচচ স্তরের অধিকারী। ২য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু অর্থ দান করেননি, তিনি সঠিক সংকল্পকারী। তিনি মনে মনে বলেন, যদি আমার অর্থ থাকতো তবে আমিও অমুক ব্যক্তির মতো (সৎ) কাজ করতাম। সেটা তার নিয়তের উপর নির্ভর করছে। ফলে তাদের দু’জনের নেকী সমান। ৩য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অর্থ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে অজ্ঞতাবশত তার সম্পদ তছনছ করে। সম্পদের ক্ষেত্রে নিজ রবকে ভয় করে না। নিজ সম্পদ নিকটাত্মীয়দের পৌঁছে দেয় না এবং সম্পদে আল্লাহর হক জানে না। সে হচেছ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের অধিকারী। ৪র্থ শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে অর্থ ও জ্ঞান কিছুই দান করা হয়নি, অতঃপর সে বলে, যদি আমাকে অর্থ দান করা হ’ত, তবে আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম। বস্ত্তত এটা নির্ভর করছে তার নিয়তের উপর। ফলে তাদের দু’জনের পাপ সমান’।[1]

অর্থাৎ এ জগতের সফলতা আখেরাতের জীবনের সফলতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ জগতে যেটা সুখ-শান্তির উৎস ভাবছি পরলোকে তাই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হ’তে পারে। ডেকে আনতে পারে স্থায়ী ব্যর্থতার চরম অন্ধকার।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সফলতার অসংখ্য বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জগতের সুখ-সমৃদ্ধি, আননদ-বিলাস, বিত্ত-বৈভবকে তুচছ বস্ত্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ‘তুমি তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা কর। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ সমূহ থেকে রক্ষা করলে তাকে তো তুমি ক্বিয়ামতের দিন অনুগ্রহ করলে। আর সেটাই হ’ল মহা সফলতা’ (গাফের ৪০/৯)।

উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত ‘মহাসাফল্য’ বিষয়টির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ‘ত্বাকওয়া’ বা আল্লাহভীরুতা। কারণ ‘ত্বাকওয়া’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ বেঁচে থাকা বা রক্ষা করা। ‘ত্বাকওয়া’ শব্দটি বিশেষত রক্ষাকবচ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত অমঙ্গল, অনিষ্টতা ও অশালীন কর্ম থেকে

সুরক্ষিত থাকাই হ'ল 'ত্বাকওয়ার' মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি অন্যায়-অপকর্ম থেকে যতটা সুরক্ষিত তিনি ততটা আল্লাহভীরু। আর ত্বাকওয়াশীল ব্যক্তিই হবে বড় সফলকাম। এদের জন্যই তো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা' (নাবা ৭৮/৩১)।

ত্বাকওয়াই সফলতার অন্যতম উপায় এবং প্রধান নিয়ামক। বৈধ-অবৈধ পন্থার পরোয়া না করে অপরের হক গ্রাস ও যাবতীয় অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে সফলতা নেই, বরং তা নিহীত আছে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার মধ্যে। যদিও সমাজ তাকে ব্যর্থ বা বিফল ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার ভয় করি না, বরং ভয় করছি যে দুনিয়াকে তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করে দেওয়া হবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল। ফলে তোমরা তার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে, যেমন তা পাওয়ার জন্য তারা করেছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[2]

প্রসঙ্গত নবী করীম (ছাঃ) বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য আলা-ইবনুল হাজরামীকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে কর আদায়ের জন্য বাহরাইন পাঠিয়েছিলেন। তিনি করের মাল নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হ'লেন। ফজরের ছালাত শেষে আনছারগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হ'লে তিনি তাদের দেখে একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো, আশা রাখ যা তোমাদের খুশি করবে। এমন মুহূর্তে তিনি সম্পদ বণ্টন না করে আগে পূর্বোক্ত জাতির ধ্বংসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আনছারদের সামনে দুনিয়ার মোহ, মায়া ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সম্যকভাবে সতর্ক করে দেন। যে আশঙ্কার কথা তিনি আমাদের ব্যাপারে প্রকাশ করেছিলেন বর্তমানে তা পদে পদে প্রতিফলিত হচেছ, দুনিয়ার সফলতাই যেন আমাদের শেষ কথা। এজন্য আমরা কোন কিছুর তোয়াক্কা করি না। অর্থ সর্বস্ব দৃষ্টি দিয়েই আমরা সফলতার বিচার করি। একজন ব্যক্তির যাবতীয় ধর্মীয় গুণাবলী, উজ্জ্বল প্রতিভা, উন্নত চরিত্র সব ধরনের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার পরও আজকের সভ্য সমাজ তাকে মেয়ে দিতে ভয় পায়। শুধু চাকুরী পেয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে। সমাজের চোখে এমন ব্যর্থ বিফল হবার কারণে যারা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের প্রতিযোগিতায় মগ্ন আখেরাত ভুলে আমরা তাদের হাতে সফলতার সার্টিফিকেট তুলে দেই। অথচ এমন কোন স্থান নেই, যেখানে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক করেননি।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ. 'নিশ্চয়ই এই দুনিয়া সুমিষ্ট সবুজ বস্তু। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এখানে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন, তোমরা কি কর্ম করছো তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। অতএব তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক ও নারী থেকে দূরে থাক। কারণ বাণী ইসরাঈলদের মাঝে সর্বপ্রথম ফিতনার উদভব হয়েছিল নারীকে কেনদ্র করেই'।[3]

উক্ববা বিন আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِىْ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

'একদা নবী করীম (ছাঃ) বের হ'লেন এবং ওহোদের শহীদদের উপরে ছালাত আদায় করলেন। যেমন তিনি মৃতদের জন্য ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হব। আল্লাহর শপথ! আমি এখন আমার হাউজ (হাউজে কাওছার) দেখতে পাচিছ। আমাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভান্ডারের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর শপথ! আমার মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য আমি শিরকের ভয় করি না; বরং আমার আশঙ্কা হচেছ তোমরা পৃথিবী নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে'।[4]

দুর্ভাগ্য যে, স্থায়ী সফলতার পথে যা প্রধান প্রতিবন্ধক তা অর্জনের জন্য আমরা অতি তৎপর। কোনভাবেই যেন আমরা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হ'তে পারছি না। ক্ষণিকের সুখ সমৃদ্ধির পেছনে ছুটতে গিয়ে আসল সফলতাকে নষ্ট করা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، 'নিশ্চয়ই পরকাল তোমার জন্য ইহকালের চাইতে কল্যাণকর' (যোহা ৯৩/৪)।

পার্থিব জগতে সফলতার লক্ষ্যে সম্পদের প্রতিযোগিতা মানুষকে যে পরকালীন সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এ নিয়ে আমাদের মোটেও দ্বিধা নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، 'অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' (তাকাছুর ১০২/১-২)।

যারা পার্থিব যশ-অর্থ-খ্যাতি অর্জন করে সাফল্য পায়নি কিংবা প্রতিষ্ঠিত হ’তে পারেনি, তাদেরই দেখা যাবে ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়ার নামী সফল ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক আগেই জান্নাতের প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ. ‘দরিদ্র মুসলিমগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তা হবে (দুনিয়ার দিন গণনা অনুযায়ী) পাঁচশত বছরের সমান’।[5]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، ‘দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের তুলনায় পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[6]

সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্য মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের হক সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। একদিকে উপার্জিত সম্পদের উৎস যেমন পরিশুদ্ধ হ’তে হবে, অন্যদিকে সম্পদ ব্যয়ের খাত সমূহ তেমনি বিশুদ্ধ হ’তে হবে। সম্পদের সাথে সংযুক্ত হকসমূহ সঠিকভাবে আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিনে তা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হ’তে পারে।

অর্থ সম্পদ ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু। মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করার অন্যতম হাতিয়ার। এজন্য ছহীহ মুসলিমের এই হাদীছটি আমাদের ইহলৌকিক জীবনে সুপথ দেখাতে পারে। আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ، وَلَا دَابَّةَ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ لَهُمْ :مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا-

‘তিনজনের একটি দল আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর কাছে আসে, তখন আমি তার কাছে ছিলাম। তারা বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! (আমর ইবনুল আছের উপাধি) আল্লাহর শপথ, আমাদের ভরণ-পোষণ, বাহন ও পাথেয় বস্তু হিসাবে খরচ করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি তাদের বললেন, ‘তোমরা কী চাও? যদি তোমরা চাও আমাদের কাছে ফেরত এসো আমরা এমন কিছু তোমাদের দিব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের জীবিকা নির্বাহের রাস্তা সহজ করে দিবেন। আর যদি তোমরা চাও তবে তোমাদের বিষয়টা শাসকের (সুলতান) নিকট উপস্থাপন করবো। আর তোমরা যদি চাও তো ধৈর্যধারণ করতেও পার। কেননা আমি আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, দরিদ্র মুহাজিরগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের

ধনীদের পেছনে ফেলে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে তারা বলল, তবে আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা কোন কিছু চাই না'।[7]

আজ যারা পার্থিব জগতে আমাদের চোখে ব্যর্থ, এ হাদীছে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আখেরাতে তাদের হিসাবের বোঝা অনেকটাই কম। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাটাও অনেকটা সহজ ও সুগম। যদি তারা অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করতে পারেন। যিনি জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন তিনিই তো পরকালের সবচেয়ে বড় সফল ব্যক্তি। এজন্যই আল্লাহ বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' (আলে ইমরান ৩/১৮৫)।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত (زحزح) যাহযাহা শব্দটি একটু আলাদাভাবে ব্যাখ্যার দাবী রাখে। মূল চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দটির অর্থ হ'ল- একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দেওয়া, স্থানচ্যুত করা। পাঠকগণ নিশ্চয়ই শব্দটির মধ্যে তরঙ্গ অনুভব করেছেন। যেহেতু শব্দটি নিষ্ক্রিয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তার অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে পারে না যদি না তাকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আর সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা। সুতরাং জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়াটাই হবে নিঃসনেদহে বিরাট সফলতা। এই জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বিষয়টি উপরে বর্ণিত 'যাহযাহা' শব্দ থেকে উদভূত। পবিত্র কুরআনে আরেকটি মাত্র স্থানে তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, সেখানেও দীর্ঘ জীবন লাভ করাটা যে মানুষকে আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ- 'তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাঙ্ক্ষী পাবে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আর তারা যা করে, আল্লাহ সবই দেখেন' (বাক্বারাহ ২/৯৬)।

এমর্মে হাদীছে এসেছে, আদি ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

‘তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন, যেখানে উভয়ের মাঝে কোন অনুবাদক থাকবে না। সে তার ডানে দৃষ্টিপাত করবে, তখন পূর্বে প্রেরিত কর্ম ছাড়া সে আর কিছু দেখতে পাবে না। বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন তার প্রেরিত কর্ম ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাবে না। তারপর সে তার সামনে দৃষ্টিপাত করবে, অতঃপর সম্মুখে জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না। অতঃপর তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ, যদিও তা খেজুরের একটা অংশ দিয়েও হয়’।[৪]

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়াটাই যে সবচেয়ে বড় সফলতা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভয়াবহ শাস্তির খেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে আমরা যে যতটুকু প্রস্তুতি নিতে পেরেছি তিনি ততটাই সফলকাম। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু মালিক আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ .وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

‘পবিত্রতা ঈমানের একটি অবিচেছদ্য অংশ। আলহামদুলিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর) মীযানকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর পবিত্রতা ও আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন) ভরপুর করে দেয়, অথবা আকাশ ও যমীনের মাঝে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে দেয়। ছালাত আলো, ছাদাক্বা (দান) প্রমাণ, ধৈর্য জ্যোতি, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল। প্রতিটি ব্যক্তি প্রভাত করছে মুক্তির বিনিময়ে (জাহান্নামের আগুন থেকে) নিজেকে বিক্রি করে অথবা নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার বিনিময়ে’।[9] আল্লাহ বলেন,لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، ‘জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী কখনো সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম’ (হাশর ৫৯/২০)।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে বিষয়টি স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুন থেকে যিনি পরিত্রাণ পাবেন এবং জান্নাত লাভ করবেন তিনিই প্রকৃত সফলকাম ব্যক্তি। পৃথিবীর সফলতার পরিধিটা অনেকটা বিস্তৃত এবং পরিসরটাও অনেকটা বহুমুখী। দুনিয়ার সফলতার চাবি হাতে পেয়ে আত্মসুখে বিভোর হয়ে চূড়ান্ত ও মহা সফলতা থেকে যেন বিস্মৃত না হয়ে পড়ি। সেজন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই ভয়ানক দিনের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!

মুহাম্মাদ ওয়ারেছ মিয়াঁ
পিএইচ.ডি গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

পরিশেষে বলতে পারি ,ইসলাম শুধু ধর্মীয় ইবাদত নয়, বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে, এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের সকল শিক্ষা ও নির্দেশনা পবিত্র কোরআন এবং রাসুল (সা.) এর সুন্নাহর মাধ্যমে এসেছে, যা একজন মুসলিমকে তার ব্যক্তিগত জীবনে চলার পথে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

সমাপ্ত